সিঁদুরচরণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥সিঁদুরচরণ॥

সিঁদুরচরণ আজ দশ-বারো বছর মালিপোতায় বাস করচে বটে কিন্তু ওর বাড়ী এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশায় তামাক টানতে টানতে বললেন,—"কে, সিঁদুরচরণ?" ওর বাড়ী ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশবছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি, গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে, সিঁদুরচরণ গরীব লোক।

জীবনে সে ভালো জিনিসের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিল না, সম্প্রতি মালিপোতাতে এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায়নি। মালিপোতায় এক বুনো মালী আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুল এখনও পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরিও নেই। বুনো বলে এদেশে সেইসব কুলিমজুরের বর্ত্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীলকুঠির আমলে রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রভৃতি থেকে এসেছিল নীলকুঠির আমলে মজুরি করতে। এখন তারা বেমালুম বাঙালী হয়ে গিয়েচে—ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্ব্বপুরুষের বোংগা পুজো ভুলে গিয়েচ কতকাল, এখন হরিসংকীর্তন করে ঘরে ঘরে, মনসা-পুজো, ষষ্ঠী-পুজো করে, কালীতলায় মানত করে।

BANGLADARSHAN.COM

এখন যদি এদের জিজ্ঞেস করা যায়—তোরা কোন দেশ থেকে এসেছিলি রে? তোদের আপনজন কোথায় আছে?

ওরা বলবে—তা কি জানি বাবু।

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না?

—শুনেচি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ-ছ পুরুষের আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্য যুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এ-হেন বুনো মালীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু—হয়তো 'ক্যাতায়নী'র অপভ্রংশ হবে নামটা। কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভাল নাম তাকে কেউ দেয়নি।

সিঁদুরচরণ পরে গোরু চরিয়ে আর পরের লাঙ্গল চষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওটবন্দি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হলো; সেবার বাইশ টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত পেলে সিঁদুরচরণ, অত টাকা একসঙ্গে তার তিন পুরুষ কখনো দেখেনি। দশ টাকার মোট বাইশখানা।

কাতু বললে—হ্যাঁ গো, দশ হাত ফুলন শাড়ীর দাম কত?

—কেন নিবি?

—দাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভেবেচি। বড্ড শখ।

—এই বয়সে ফুলন শাড়ী পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না?

কথাটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে পড়লো, মনে হলো সিঁদুরচরণের। অল্প বয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল? আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হোলোই তখন অল্পবয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি? তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ফুলন শাড়ী শুধু নয়—তার সঙ্গে এলো একখানা সবুজ রঙের গামছা।

কাতু খুশিতে আটখানা। বললে—শাড়ীখানা কি চমৎকার—না?

BANGLADARSHAN.COM

—খুব ভালো। তোর পছন্দ হয়েচে?

—তা পছন্দ হবে না? যাকে বলে ফুলন শাড়ী।

—আর গামছাখানা কেমন?

—অমন গামছাখানা কখনো দেখিইনি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারবো না প্রাণ ধোরে। তাহলি খারাপ হোয়ে যাবে।

—খারাপ হয় আবার কিনে দেবো। আমার হাতে এখন কম ট্যাকা না।

সেদিন কামার-দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনলো সিঁদুরচরণ। বাড়ী এসে কাতুকে বললে—কাতু, তুই থাক, আমি দুদিন দেশ বেড়িয়ে আসি—

—কোথায় যাবা?

—একদিকে বেড়িয়ে আসি—

—আমারে নিয়ে যাবা না?

—তুই যাস তো চল—ভালোই তো—

দুজনে জিনিসপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরি হলো। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে—তুমি যাও, আমি যাবো না। গোরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যে। যদি আসতে দেরি হয় বাছুরটা বাঁচবে না।

—তুই যাবিনে?

—আমার গেলি চলবে কেমন করে? বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটা আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও, আমি যাব না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হলো বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়ীতে সামান্যই চড়েচে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গোরুর হাট দেখতে। সে জীবনে একবার মাত্র রেলগাড়ী চড়া। পরের চাকরি করতে সারা জীবন কেটেচে।

স্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়েচে। কেউটেপাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাচু জিজ্ঞেস করলে—ও সিঁদুর চরণ, কনে চলেচ এস সকালে?

—একটু ইস্টিশানে যাবা।

BANGLADARSHAN.COM

—কোথায় যাবা?

—বেড়াতি যাবা রাণাঘাটের দিকি।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসলো। কাছেই একটা বাঁশনি বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে? সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি বাঁশ। এইরকম কেঁচো, এই রকম কচুর ফুল কি অন্য জায়গাতেও আছে? দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি, বড় মজা দেশবিদেশে বেড়ানো।

সিঁদুরচরণ স্টেশনে পৌঁছবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং করে। একজন ওকে বললে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ী আসচে।

টিকিটের জানলায় গিয়ে ও বললে—ও বাবু, একখানা টিকিট দ্যান মোরে—

টিকিটবাবু বললে—কোথাকার টিকিট?

—দ্যান বাবু, রাণাঘাটেরই দ্যান আপাতোক একখানা।

গাড়ীতে উঠে সিঁদুরচরণের ভীষণ আমোদ হলো। সে আমোদ রূপান্তরিত হলো বার বার ওর ধূমপান করার ইচ্ছায়। ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরায়, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রাণাঘাটে গাড়ী এসে পড়াতে ও আশ্চর্য্য হয়ে পড়লো। ষোল মাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেই নি।

রাণাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায়? এমন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায়নি।

স্টেশনের এপারে একটা উঁচুমত রোয়াক বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেললাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালার তলায় বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান, বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এ রকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নীচে। ও সেখানে গিয়ে বললে—কনে যাবা?

তারা বললে—মুকসুদাবাদ, বেলডাঙা।

—সে কনে?

—উত্তুরে।

BANGLADARSHAN.COM

—কোথায় গিয়েলে?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর।

মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ীর কাছাকাছি। লোকগুলো সেকান থেকে আসছে শুনে সিঁদুরচরণের মনে হলো এই দূর বিদেশ-বিভুয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুর নসিবদ্দি সেখরে চেন?

—তেনার বাড়ীতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্তর দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুইও তারে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা?

—বেড়াতে বেরিয়েচি, যেতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবো।

ওদের মধ্যে একজন বললে—তবুও কতদ্দুর যাওয়া হবে? আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো। আমি সেখানে যাবো।

—সে কনে?

–কেষ্টলগর ছাড়িয়ে।

–তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিটখানা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এসো ভাই।

–দ্যাও টাকা।

–কত নাগবে?

–এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট কেটে এসে তার হাতে দিল। সিঁদুরচরণ পুঁটুলির মধ্যে কাতুর দেওয়া ধুপি-পিঠে খেতে লাগলো এবং তার সঙ্গীকে দিলে। ধুপি-পিঠে আর কিছুই নয় শুধু চালের গুঁড়োর পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন ইঁটের মত জিনিস গলা দিয়ে নামে না–কিন্তু গুড় সে সঙ্গে করে আনেনি কাপড়চোপড়ে লেগে যাবে বলে। ওর সঙ্গী বল্লে–একটু রসগোল্লার রস কিনে আনবো? এ বড় শক্ত।

–হ্যাঁ গা, উত্তরের গাড়ী কখন আসবে?

–এই এল। তামুক খেয়ে ল্যাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা, পান, পাঁউরুটি ফিরিওয়ালাদের চিৎকারে প্লাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠল। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো গাড়ীতে ওঠাবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তার নতুন সঙ্গী তাকে একটা কামরায় ওঠালে।

BANGLADARSHAN.COM

গাড়ী রাণাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক কল্কে তামাক সেজে হাঁপ ছেড়ে বললে–বাবাঃ–এর নাম গাড়ী চড়া? কি কাণ্ড।

সিঁদুরচরণের মনে হলো কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশে বিভুঁইয়ের দিকে চলেচে। না এলেই যেন ছিল ভালো। কে জানে বাড়ীর বার হলেই এসব হাঙ্গামা ঘটবে? বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি? তার টাকা কটা কেড়ে নিতেও পারে।

তার সঙ্গী তাকে বলে দিচ্চে–এই উলো। এই বাদকুল্লো, এই কেষ্টলগর।

–কেষ্টলগর? কই দেখি দিকি। নাম শোনা আছে বহুৎ দিন যে।

সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ী, দু-চারটে কোঠাবাড়ী। তাই দেখেই যে মহা খুশি। মস্ত জায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মত কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানা ছাঁদে গল্প শোনাতে হবে বাড়ী ফিরে।

আরও একটা স্টেশন গেল। পরের স্টেশনেই বোধ হয় তার সঙ্গী বললে—নামো নামো বাহাদূরপুর।

সিঁদুরচরণ বোঁচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সে চেয়ে দেখে ধূ ধূ মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন—চারিধারে কুলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ। দূরে দূরে দু-চারটে তাল গাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যটা হু হু করে উঠলো।

কোথায় কাতু, কোথায় তাদের মালিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েচে!

মনে মনে বললে—এ্যানধারা বিদেশেও মানুষ আসে। ভগবান, এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে।

ওর সঙ্গী বললে—চলো।

—ও বলে—কনে যাবো?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দু-কোশ পথ।

—সেখানে যাবো?

—যাবা না তো এখানে থাকবা কোথায়? খেতে দেতে হবে তো?

BANGLADARSHAN.COM

—কি নাম তোমাদের গাঁ?

—গোয়ালবাথান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সিঁদুরচরণ চললো নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ী। ক্রোশ দুই হাঁটদার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখে ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ী। ভাত-পানি খাও, হাত-মুখ ধোও।

সিঁদুরচরণ বললে—ভাত-পানি খাব কি, মুই কনে এসে পড়েচি তাই শুধু ভাবতি লেগেচি।

—কদ্দুর আসবা আবার।

—কোথায় ছেলাম আর কনে আলাম। উঃ! এ পিরথিমির কি সীমেমুড়ো নেই? হ্যাঁ গা, আর কদ্দুর আছে ইদিকি?

—আরে তুমি পাগল নাকি? কী বলে আর কী করে। ল্যাও ভাত-পানি খাও।

ভাত খেয়ে সিঁদুরচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

বড় বড় মাঠ, দূরে তালগাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি, আর চারিদিকেই আকের খেত। উ-ই কি-একটা গ্রাম দেখা যায়। ওর পরও পিরথিম আছে ওদিকে? বাবাঃ—

একজন লোককে বললে—হ্যাঁগা, ইদিনে এত আকের চাষ কেন?

—কেন, বেলডাঙায় চিনির কল আছে। আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো—

—সব আক?

—এ কী আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিক ষাট সত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ, শুদ্ধ—আক।

ওর বন্ধুর বাড়ীতে দিন দুই থাকার পরে আকের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়লো। ওদের পরামর্শে সিঁদুরচরণও আকের ক্ষেতে আক কাটবার কাজে লেগে গেল। আট আনা রোজ। সিঁদুরচরণদের দেশে মজুরের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে মজুরির রেট বেশ ভালোই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার, হবেই বা না কেন, কোন দেশ থেকে কোন দেশে এসে পড়েচে—এখানে সবই সম্ভব।

নাগরপাড়ার ওপারে বোরগাছি, তার পাশে ধুবলি। এই দুই গ্রাম থেকে অনেক মজুর আসতো আকের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সিঁদুরচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা? সেখানে ঘোষ মশায়দের বাড়ীতে একজন কিষাণ দরকার। দশ টাকা মাইনে, খাওয়া-পরা।

সিঁদুরচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হলো। তাদের দেশে কৃষাণদের মাইনে মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, খাওয়া-পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কৃষাণদের রেট এক টাকা বেড়েচে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিকবে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে থাকবে কতদিন?

BANGLADARSHAN.COM

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরি করবা না?

—মরতি যাবো কেন বিদেশে পড়ে? মোদের গাঁয়ে চাকরির অভাবডা কী?

খেয়ে দেয়ে হাতে দু পয়সা জমেছে যখন, তখন পরের চাকরি করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভালো একখানা রঙিন গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরের হাটে একদিন।

রঙিন গামছাখানাই হলো কাল—এখানে কিনে পর্য্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগলো কাতু যদি তাকে এ গামছা-কাঁখে না দেখলো তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি? সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল সে কাতুর জন্য?

একদিন কাজকর্ম্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েচে। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ ছায়া ফেলেচে অনেকখানি ফাঁকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে গোঁজ খুলে পয়সাকড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে উনিশ টাকা তেরো আনা জমেচে মজুরি করে।

সামনে একটা খালে তেরো-চোদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুক গুগুলি তুলচে। ও বললে—কি তোলচো, ও খুকি?

মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি?

—তোলচো কী?

—গুগলি।

—কি হবে?

মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাবো।

—কি জাত তোমরা?

—বাউরি।

BANGLADARSHAN.COM

—বাড়ী কনে?

মেয়েটি আবার ওর দিকে যেন খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বললে—নটবরপুর।

আর কোন কথা হয় না। মেয়েটা আপন মনে গুগলি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড় মনে হয়, আর থাকা যায় না। এ কোন মুল্লুক, কতদূর বিদেশ বিভুঁই, সেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ-পিতেমোর জন্মে শুনেচে বাউরি বলে কোনো জাতের কথা, যারা খালে বিলে গুগলি তুলে খায়?

ওর মনটা হু হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় খায়। যদি এই বিদেশে মারা যায়?

কাতুর সঙ্গে তাহলে দেখাই হবে না।

কাতু সজনে-তলায় গোরু বেঁধে বিচুলি কেটে দিচ্ছে, সন্দের পিদিম ঘরে ঘরে সবে জ্বালা শুরু হয়েচে, এমন সময়ে রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠলো—বল হরি হরিবোল। ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাঁদুড়ের গঙ্গাতীরে।

কাতুদের পাড়ার কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কনেকার মড়া?

–সনেকপুর।

–কি জাত হ্যাঁ গা?

–সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ? তেনার ছেলে। কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড় কষ্ট হলো শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারা গেল–বাপ-মায়ের কী কষ্ট। এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানে না। খবর পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বলে–কানচিস কেন রে?

–মনটা বড্ড কেমন করচে।

দূর। বাছুরটা ধর। ইদিক আয় দিনি।

–একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি? বিপিন ঘোষের ছেলে।

–নিয়ে গেল তো তোর কি? মর মাগী। বাছুর ধর। এখুনি পিইয়ে যাবে।

শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েচে। আর আসবে না, এতদিন বোঝা গেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে–বিয়ে কার, সোয়ামী নয় তো। গিয়েচে তা কী হবে। গোরুটা রয়েচে, অমন ভাল বকনা বাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

BANGLADARSHAN.COM

আরও দিন-পনেরো কাটলো...

কাতুর চোখের জল শুকোয় না। রোজ সন্ধ্যেবেলা মন হু হু করে। এমন বকনা বাছুর হলো গরুটার, বার দোয়া শেষ করে আজ সেই গোরু দেড় সের দুধ দিচ্চে দুবেলায়–ও এসে দেখুক। নইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে, যেদিকে দুচোখ যায়।

পাড়ার ছিচরণ সর্দ্দার আজকাল ওর বাড়ী বড় যাতায়াত শুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর সন্ধেবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে–ছিচরণ এসে বললে–ও কাতু।

–কি?

–ঘরে আছিস?

–কেনে?

–একটু তামাক খাবো?

–তামুক নেই গো।

–পান সাজ একটা।

–পান কনে পাবো? মানুষ ঘরে না থাকলি ওসব থাকে? তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দ্দার দমবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে আজ দু'বছর। অবস্থা ভালো, এক আউড়ি ধান ঘরে তুলেচে গত ভাদ্র মাসে। একবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্য্যের ফিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দুএকদিন অন্তর আসে। বসতে না বললেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভালো লাগে না এ সব। আর কিছুদিন সে দেখবে–তারপর গোরু বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির। ডাক দিলে–ও কাতু!

–কি?

–বাবাঃ, তা একটু ভালো করে কথা বললি কি তোর জাত যাবে?

–তুমি রোজ রোজ ভরসন্ধেবেলা এখানে আস কেন?

BANGLADARSHAN.COM

–তার দোষটা কি?

–না তুমি এসো না। লোকে কি মনে করবে।

–একটা কথা বলি তোর কাছে। আমার সংসারডা তো গিয়েচে তুই জানিস। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

–তা কি করবো আমি?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হলো না। আমতা আমতা করে বললে–না না তাই বলচি।

কাতু বললে–এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায় না। বলে–ওরে দাঁড়া। যাবো, যাবো, থাকতি আসিনি। এই দু-বিশ ধান কর্জ্জ দেলাম পাঁচরে। বলি হয়েচে দেড় পৌটি ধান, তা লোকের উপকারে লাগে তো লাগুক। ধান ঝেড়ে দিয়ে-থুয়ে এই আসচি। বড্ড কষ্ট হয়েছে আজ।

কাতু ঝাঁঝালো সুরে বললে–কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে?

–তোর সঙ্গে দুটো কথা বললি আমার মনডা জুড়োয় সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। আমি যখন গোরু চরাই তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম।

–বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কসতি কে বলচে তোমারে?

–হ্যাঁরে, সিঁদুরচরণ তোরে ফেলে এমনিই পালালো, না পয়সা কড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে? চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা চাই তো?

–সেজন্যি তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম মুই, জিজ্ঞেস করি?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসলো। তার বয়েস হয়েচে একথা সত্যি, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিসের মুখ এই ক'বছর দেখেচে, সিঁদুরচরণের কাছ থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়সে? একটা পেট চলে যাবে, ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবে না, সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়ালো। কাতু জানে, ও কেন আসে। আসে একটা নিয়ে অবিশ্যি। বললে–একটু হলুদবাটা দেবা?

–নিয়ে যাও?

–দুসের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দ্দারের বাড়ী থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোনো জিনিসের অভাব নেই। হলুদ বলো, ঝাল বলো, পেঁজ বলো, সরষে বলো–সব মজুদ। গুড় আমাদের দেয় বছরে একখানা করে। ওর ঘরে চার-পাঁচ মণ গুড় হয় ফি বছর।

BANGLADARSHAN.COM

কাতু বললে–তা এখন হলুদ-বাটনা নেবা?

শিবির মা বললে–হলুদ বাটনা দ্যাও একটু। মাছ রাঁধবো।

–তবে নিয়ে যাও।

–তোমার শরিল খারাপ হলি দেখাশোনা করে কে তাই ভাবচি।

–সে ভাবনা তোমায় ভাবতি কেডা গলা ধরে সেধেচে শুনি? গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে ডাক দিলে–ও কাতু।

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে–তুমি। ওমা, আমি কনে যাবো।

শিবির মা অন্য দিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পায় না শেষে।

এই হলো সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস। এর পর থেকে মালিপোতা গ্রামের মতো বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ধরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণ কাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে

আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুরপুর গিয়েল। জোয়ান বয়েসে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশ।

অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানুষের কীর্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুমরির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাট থেকে সেদিন ফিরচে আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে?

সিঁদুরচরণ বিনম্র হাস্যের সঙ্গে বললে—তা গিয়েলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

—বটে। আচ্ছা সে কতদূর?

—আপনি কেষ্টলগর চেন?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে?

—কোন্ দিক জানো?

—তা কি করে জানবো, আমি কি সেখানে গিয়েচি?

BANGLADARSHAN.COM

বাহাদুরপুর কেষ্টলগরের দুই ইস্টিশনের পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় এই দেখবার জন্য যে, তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।

॥সমাপ্ত॥